শেখ রাসেল এক অনাগত ভবিষ্যতের যবনিকা!

● মো. আসলামুল হক

তখন হেমন্তকাল, তারিখটা ১৮ অক্টোবর ১৯৬৪। নবান্নের নতুন ফসলের উৎসব বাঙালির মাঝে ছিলো না, তখনের হেমন্তে ছিলো লড়াই আর যুদ্ধের আভাস। ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সামনে দাঁড়িয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, অনিশ্চিত অন্ধকার পথের যাত্রা ছিলো এ অংশের জনগণের নিত্যসঙ্গী। সেই আঁধার পথ অতিক্রম করে তখন আলোর স্বপ্নে বিভোর বাংলার মানুষ। যার হাত ধরে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটবে তাঁর ঘর আলোকিত করে সেদিন জন্ম নিল এক ছোট্ট শিশু। শিশুর নাম রাখা হলো রাসেল। মূলত জন্মের আগেই ঠিক ছিলো যে, ছেলে শিশু হলে নাম রাখা হবে রাসেল। কিন্তু এত নাম থাকতে কেনোই বা রাসেল? এই প্রশ্নের উত্তরে যেতে হলে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার যুদ্ধবিরোধী শান্তিপূর্ণ এক মানবিক সত্ত্বাকে খুঁজে পাবো আমরা।

শেখ রাসেলের জন্মের দু তিন বছর আগ থেকেই কিউবাকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছিলো। শুধু স্নায়ুযুদ্ধ বললে ভুল হবে বরং গোটা বিশ্ব এ দু'দেশের সর্বোচ্চ কূটনৈতিক তৎপরতা তখন প্রত্যক্ষ করছে। এই স্নায়ুযুদ্ধ তখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। ঠিক তখনই বিশ্বমানবতার প্রতীক হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল। বার্ট্রান্ড রাসেল কেবলমাত্র একজন দার্শনিকই ছিলেন না, ছিলেন পারমাণবিক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের একজন বড় মাপের বিশ্ব নেতাও। বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্যে 'কমিটি অব হানড্রেড' গঠনের মাধ্যমে বার্ট্রান্ড রাসেল তখন গোটা বিশ্বে এক আলোচিত নাম। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা দু'জনেই ছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেলের ভক্ত। বার্ট্রান্ড রাসেলের বইয়ে বিভোর ছিলেন এই দম্পতি। তাই মহান বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে নিজেদের সন্তানের নাম রাখলেন রাসেল। সামনে যুক্ত হয় পারিবারিক টাইটেল, এতে শিশুটির পুরো নাম হলো 'শেখ রাসেল'।

১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবরে ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনে আলোকবর্তিকা হয়ে আসে ছোট্ট শিশু শেখ রাসেল। শিশুটির আগমনে ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে তখন আনন্দ ধারা বহমান। নতুন শিশুকে নিয়ে সবাই উৎসবে মেতে ওঠে। যদিও বঙ্গবন্ধু ভবন তখন আজকের রূপে ছিল না, বাড়ির কাজ ছিল চলমান। নীচতলায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘরেই রাসেল জন্ম নিয়েছিলো।

জন্মলগ্ন থেকেই রাসেল ছিল চঞ্চল প্রকৃতির। সারা বাড়ি সব সময় মাথায় তুলে রাখত। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের মাধ্যমে শেখ রাসেলের শিক্ষাজীবন শুরু হয় চার বছর বয়স থেকে। শেখ হাসিনার স্মৃতিচারণে জানা যায়, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে শেখ রাসেলের জন্য একজন গৃহশিক্ষিকা রাখা হয়। খুব দুষ্ট প্রকৃতির রাসেলের কথা তার শিক্ষিকাকে শুনতে হতো, নইলে সে পড়াশোনায় মনোযোগী হতো না। তাই শিক্ষিকাও রাসেলকে আদর করে সে অনুযায়ী শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষিকার খাবার-দাবারের ব্যাপারে খুব সচেতন ছিল শেখ রাসেল। প্রত্যেক দিন শিক্ষিকার জন্য দুটি করে মিষ্টি বরাদ্দ থাকতো এবং শিক্ষিকাকে তা খেতে হতো রাসেলের ইচ্ছানুযায়ী। এভাবেই চলছিল শেখ রাসেলের বাল্যকাল।

বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী 'কারাগারের রোজনামচা' পড়াকালীন সময়ে শেখ রাসেলকে সময় দিতে না পারার চাপা কষ্টের বর্ণণা যেভাবে বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন তা একজন পাঠকের নিজের অজান্তে ই চোখে অশ্রুর আনাতে বাধ্য। ভালোবাসার মানুষটির মুখে একটু কষ্টের ছাপ দেখলে মনে হয় পুরো পৃথিবী অন্ধকার, কিন্তু বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সেই অন্ধকারকে জয় করেছেন বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতা এনে দেয়ার মাধ্যমে। বাবা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে জেলে বন্দি থাকার কারণে একটা সময় শেখ রাসেল মা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকেই 'বাবা' বলে সম্বোধন করতো। ভেতরের এ কষ্টটাই পিতা মুজিবকে অসংখ্যবার বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু শিশু রাসেলের প্রতি সময় না দিতে পারার ভেতরকার এই বেদনাই অনেকবার ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে যখন রাজবন্দি হিসেবে জেলে বন্দি ছিলেন বঙ্গবন্ধু সে সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাক। 'কারাগারের রোজনামচা'তে শেখ রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছেন : '৮ ফেব্রুয়ারি ২ বছরের ছেলেটা এসে বলে, আব্বা বাড়ি চলো।' কী উত্তর ওকে আমি দিব। ওকে ভোলাতে চেষ্টা করলাম ও তো বোঝে না আমি কারাবন্দি। ওকে বললাম, 'তোমার মার বাড়ি তুমি যাও। আমি আমার বাড়ি থাকি। আবার আমাকে দেখতে এসো।' ও কি বুঝতে চায়! কি করে নিয়ে যাবে এই ছোট্ট ছেলেটা, ওর দুর্বল হাত দিয়ে মুক্ত করে এই পাষাণ প্রাচীর থেকে! দুঃখ আমার লেগেছে। শত হলেও আমি তো মানুষ আর ওর জন্মদাতা।

অন্য ছেলেমেয়েরা বুঝতে শিখেছে। কিন্তু রাসেল এখনো বুঝতে শিখেনি। তাই মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতে চায় বাড়িতে।' এই ছিল শেখ রাসেলের প্রতি বঙ্গবন্ধুর দরদ যা ফুটে ওঠে জাতির পিতার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে।

শেখ রাসেলের স্মৃতি সর্বদাই বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে তাড়া করে বেড়ায়। স্মৃতিচারণ করতে বসলে তাদের গলা ধরে আসে, চোখ ভিজে যায়। বেশিক্ষণ বলতে পারেন না কিছু। প্রয়াত সংসদ সদস্য, সাংবাদিক এবং শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বেবি মওদুদের লেখনীর মাধ্যমে জানা যায়, রাসেল একদিন মাকে জিজ্ঞেস করে, 'মা আব্বার কাছে যাবে না?' মা কোনো উত্তর দেন না। শুধু তাকে বুকের কাছে টেনে আদর করেন। রাসেল আবার জিজ্ঞেস করে, 'মা, আব্বার নাকি ফাঁসি হবে। ফাঁসি কি মা?' মা বলেন, 'কে বলেছে তোমাকে এ কথা?' রাসেল উত্তর দেয়, 'সেদিন কাকা আর দুলাভাই, কামাল ভাই বলছিল, আমি শুনেছি মা।' এমনকি বেবি মওদুদের লেখায় উঠে আসে শেখ রাসেলের 'জয় বাংলা' বলে উচ্চস্বরে স্লে-াগান দেয়ার ঘটনাও। রাসেল বেশ অনুভূতিপ্রবণ। গল্প শুনতে ভীষণ ভালো লাগত তার। বাড়ির লাইব্রেরি থেকে বই এনে রাসেলকে গল্প পড়ে শোনাতেন বোনেরা। মজার ব্যাপার হলো, একই গল্প ক'দিন পর রিপিট করতে গিয়ে দুয়েক লাইন বাদ পড়লেই রাসেল ধরে ফেলত, বলত- সেই লাইনটা পড়লে না কেন? সব কিছু নিয়েই যে তার একটা আলাদা চেতনা কাজ করত ওই বয়স থেকে সেটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার! এ ক্ষেত্রে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। একদিন একটা কালো বড় পিঁপড়া তাকে কামড় দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ দেয়া হয় কিন্তু আঙুলটা ফুলে যায়। তারপর থেকে সে আর কালো পিঁপড়া ধরতে যেত না কিন্তু ওই পিঁপড়ার একটা নাম দিয়ে দিল। কামড় খাওয়ার পর থেকেই কালো বড় পিঁপড়া দেখলে বলত 'ভুট্টো'!

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। রবীন্দ্রনাথের কথা কতোটুকু সত্য সে প্রসঙ্গে না গিয়ে অন্তত এটুকু বলা যায়, মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণেই বঙ্গবন্ধু সবচেয়ে বড় ধোঁকাটি খেয়েছিলেন! ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়ি সেদিন যেন গণহত্যার মঞ্চ হয়ে উঠেছিল। আর এই ভয়ংকর দৃশ্য মৃত্যুর আগে শেখ রাসেলকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত ও বিশ্বস্ত কর্মচারীরা রাসেলকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেও অভ্যুত্থানকারীদের চোখে ধরা পড়ে যায়। পরবর্তীতে প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুর রহমান শেখ রমার জবানবন্দীতে শেখ রাসেল হত্যার পুরো বর্ণণা পাওয়া যায়। আতঙ্কিত শিশু রাসেল ভয়ে কর্মচারী মুহিতুল ইসলামের পেছনে পালিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু কোনো কাকুতি-মিনতি কিংবা নিষ্পাপ মুখশ্রী নিষ্ঠুর দুর্বৃত্তদের মন টলাতে পারেনি। সেই অন্ধকার রাতে রাসেল তাকে জড়িয়ে বলেছিল, 'ভাইয়া ওরা আমাকে মারবে না তো?' মুহিতুল আশ্বস্ত করেছিলেন না, ওরা তোমাকে কিছু করবে না। হয়তো তিনি নিজেও বিশ্বাস করেছিলেন যে, এ রকম একটি নিষ্পাপ শিশুর শরীরে কোনো জঘন্যতম পাপীও আঘাত করতে পারে না। কিন্তু মুহিতুলের সেই বিশ্বাস ভাঙতে সময় লাগেনি। রাসেল মায়ের কাছে যেতে চাইলে ঘাতকদেরই একজন তাকে সেখানে নিয়ে যায়। রাসেল সেখানে তার মায়ের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে মিনতি করেছিল, আমি হাসু আপার কাছে যাব। কিন্তু ইতিহাসের ঘৃণিত ঘাতকদের মন এতে গলেনি। ঘাতকদের একজন এই সময় শিশু রাসেলকে গুলি করে হত্যা করে। পরবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যে জাতি যখন এই নির্মম কাহিনী জানতে পারে তখন কারো পক্ষে চোখের পানি রাখা সম্ভব হয়নি। কোনো মানুষের পক্ষে এ ধরনের অপকাণ্ড করা সম্ভব তা যেন সবার কাছে বিশ্বাসেরও অতীত।

আজ থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগে শিশু রাসেলের মৃত্যু হলেও শেখ রাসেল আছে এদেশের প্রতিটি মানুষের অন্তরে।

শেখ রাসেলের শৈশব বিকশিত হবার আগেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। জীবনের উচ্ছ্বাস, আবেগ, অনুভূতি, ভালোবাসা এই মানবিক বিষয়গুলো বুঝার আগেই ঘাতকদের নির্মম বুলেটের আঘাতে না ফেরার দেশে চলে গিয়েছে ছোট্ট শিশু রাসেল। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিরা তাকে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু জাতির জনকের রক্তধারাই আজ বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বিশ্বের রোল মডেলে পরিণত করছে বাংলাদেশকে। আমরা আশা রাখছি, খুব দ্রুতই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে যেসব খুনিরা শেখ রাসেলের শৈশব কেড়ে নিয়েছে, সেসব অপরাধীদের দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করা হবে।

লেখক : সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৪

বিজিবি-বিএসএফ ইস্যু নিয়ে মুখ খুললেন আসিফ নজরুল

স্বদেশ-বিদেশ ডেস্ক ::

সম্প্রতি বিজিবির গুলিতে বিএসএফ সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশেই বেশ আলোচনা চলছে। এবার সেই হাওয়ায় গা ভাসালেন বাংলাদেশের প্রতিটি সমসাময়িক বিষয়ে সবসময় নিজের মতামত দেয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল।

শনিবার সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক একাউন্ট থেকে তিনি এই বিষয়ে একটি স্ট্যাটাস দেন। পাঠকদের জন্য তার সেই স্ট্যাটাসটি হুবহু তুলে ধরা হলো- 'দুদিন অপেক্ষা করলাম বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের জন্য।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আপনি না নিজের দেশের মানুষের হত্যাকে জায়েজ করেছিলেন? বলেছিলেন যে অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয় বা চুরি করতে যায় বলে তাদেরকে ভারতীয় সীমান্তে হত্যা করা হয়।

আপনাকে প্রশ্ন করি, অবৈধভাবে মাছ চুরি করতে এসেছিল বলে ভারতের জেলেদের কি গুলি করেছিল বিজিবি? আপনার বক্তব্যমতে তাদেরকে কি হত্যা করা উচিত ছিল বিজিবি-র? একথা বলা কি উচিত হবে আপনার? হবে না। তাহলে নিজের দেশের মানুষকে যখন হত্যা করা হয় তখন কেন তার সাফা গান আপনি? নিজের দেশের মানুষের জীবন এতো কেন তুচ্ছ আপনার কাছে? ভারত খুন করলেও তার পক্ষে কেন বলতে হবে আপনাকে? বাংলাদেশের মানুষ হয়ে, মুক্তিযোদ্ধার দেশের মানুষ হয়ে অন্যদেশের প্রতি এতো নতজানু কিভাবে হন আপনি?'

'উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শক্তিশালী বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে'

স্বদেশ-বিদেশ ডেস্ক ::

'উন্নয়নের পথে বিশেষ করে এজেন্ডা ২০৩০ অর্জনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবিলায় অবশ্যই শক্তিশালী বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে'। ৭৪তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২য় কমিটির সাধারণ বিতর্কে অংশ নিয়ে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন। এক্ষেত্রে তিনি ওডিএ (উন্নয়ন সহযোগিতা) বাণিজ্য, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশসমূহকে পারস্পরিকভাবে আরও অধিক সহযোগিতার আহ্বান জানান। এছাড়া উত্তর-দক্ষিণ সহযোগিতার পরিপস্পরিক হিসেবে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা কাঠামোর সকল সুবিধা ও সম্ভাবনা পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগানোর প্রতিও গুরুত্বরোপ করেন রাষ্ট্রদূত মাসুদ।

উন্নয়ন ও সফলতা অর্জনে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে রাষ্ট্রদূত মাসুদ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব, সাহসী ও সুদৃঢ় উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জন-কেন্দ্রিক উন্নয়ন নীতিমালার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমগ্র-সমাজ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বাংলাদেশ আজ শক্তিশালী আর্থ-সামাজিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে।'

দারিদ্র বিমোচন, টেকসই প্রবৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনে সুরক্ষা, মানব-সম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের উন্নয়নের নানা দিক তুলে ধরেন স্থায়ী প্রতিনিধি। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে মাথাপিছু জাতীয় আয়, রপ্তানি, বৈদেশিক বিনিয়োগ, শক্তিশালী বেসরকারি খাত সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে অসমতা দূর, লিঙ্গ সমতা, সার্বজনীন এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্মত শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তি, বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ, শিক্ষাবৃত্তি ও ভাতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা সরকারের ব্যাপক সাফল গাঁথার নানা তথ্য চিত্র।

ডিজিটাল বাংলাদেশের সফলতার বিষয়টি তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত মাসুদ বলেন, প্রযুক্তিতে সকলের সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমে সরকার মানব মূলধন তৈরি করছে। দেশব্যাপী স্থাপন করা হয়েছে ৫ হাজার ৮ শত ডিজিটাল সেন্টার যা জনগণের দোরগোড়ায় প্রায় ৬ শ' ধরনের ই-সেবা পৌছে দিচ্ছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ তার প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছে মর্মে উল্লেখ করে স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, এটি সম্প্রচার-ভিত্তিক সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছে দেওয়াসহ যোগাযোগ উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে।

স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্পসমূহ অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়া। বাংলাদেশ যাতে উন্নয়নের এই অদম্য অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে পারে সে জন্য রোহিঙ্গা সমস্যার মতো সমস্যার সমাধানে আরও উদার ও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২য় কমিটি সদস্য দেশসমূহের উন্নয়নের সাথে প্রাথমিকভাবে সম্পর্কিত এমন অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিষয়সমূহ নিয়ে কাজ করে।

বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তিতে সফল: মোস্তাফা জব্বার

স্বদেশ বিদেশ ডেস্ক :

ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশ এখন তথ্য প্রযুক্তিতে সফল একটি দেশের নাম

রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে কমনওয়েলথ টেলিযোগাযোগ সংস্থার ৫৯তম আন্তর্জাতিক কাউন্সিল সভা ও বার্ষিক ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। ফাইভ জির জন্য তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা, সাইবার নিরাপত্তা ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ কাজ করছে বলে জানিয়েছেন মোস্তাফা জব্বার। মন্ত্রী বলেন, কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশ এখন তথ্য প্রযুক্তিতে সফল একটি দেশের নাম। এবারের সম্মেলনে ১৫টি সেশনের একটি বড় অংশজুড়ে ৫জি ও সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি থাকবে।

বিটিআরসির চেয়ারম্যান জহুরুল হক জানান, এ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একদিকে যেমন নিজেদের প্রযুক্তি সম্ভবনা তুলে ধরতে পারবে, অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্কও জোরদার হবে। অনুষ্ঠানে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি একেএম রহমতউল্লাহ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব অশোক কুমার বিশ্বাস, সিটিও চেয়ারম্যান ও গণতান্ত্রিক ফিজির যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অর্থ, গণ উদ্যোক্তা, জনসেবা, যোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রী এবং দেশটির এটর্নি জেনারেল আইয়াজ সৈয়দ খাইয়ুম, আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিউ) উপ-মহাসচিব মেলকম জনসন এবং কমনওয়েলথ টেলিযোগাযোগ সংস্থার ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব (এরপর ১৯ পৃষ্ঠায়)